এক টুকরো গল্পে

সে প্রায় এক যুগ আগের কথা। দাঁড়িয়ে আছি পৌরসভা ভবনের সামনে। পুরোনা পৌরসভা ভবন। তৎকালীন পৌ কমিশনার আবদুল বাসিত চৌধুরী অত্যন্ত বিনয় সহকারে বললেন তাঁদের বাসায় নিয়ে যেতে চান। যদি একটু কষ্ট করে তাঁর সাথে যাই... সামনেই কলেজ রোডে তাঁদের বাসা। কৌতূহল চেপে রেখেই তাঁর সাথে যেতে রাজী হলাম। হাঁটতে হাঁটতেই কথা হচ্ছিলো আমাদের। তিনি বললেন, 'আপনাকে আব্বার সাথে আলাপ করিয়ে দিতে চাই, তিনি খুব আগ্রহী আপনার সাথে পরিচিত হতে। মনের ভিতরে বিস্ময় চেপে রেখে পথ চলছি। কেন বা কিসের জন্য তাঁর আব্বা পরিচিত হতে চান সে প্রশ্ন বাসিত চৌধুরীকে করেনি। তিনি অবশ্য বললেন যে, তাঁর আব্বা সম্প্রতি ইংল্যান্ড থেকে দেশে এসেছেন।

সামান্য পথ। কথা বলতে বলতেই ফুরিয়ে গেল। আমরা কলেজ রোডে তাঁদের বাসার সামনে। তখন বর্ষাকাল। দোতলা বিশিষ্ট নতুন দালান। মনে হচ্ছিল দালানটির কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। নতুন বাসার চারদিকে মাটি ভরাট হয়নি। তাই চারদিকে বৃষ্টির জল থৈ থৈ করছে। এ অবস্থাতেই বাসিত চৌধুরী আমাকে নিয়ে গেলেন দোতলায়।

নতুন দালান। সম্ভবত ঘর গুছানোর কাজ শেষ হয়নি, একজন মধ্য বয়সী লোক শোয়ে ছিলেন পালঙ্কে। বাসিত চৌধুরী 'আব্বা' বলতেই তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন পাশেই চেয়ার টেবিল ছড়ানো ছিটানো। বাসিত চৌধুরী পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমরা করমর্দন করলাম। প্রথম দর্শনে এই মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে একজন তেজী বলেই মনে হলো। চেয়ারে বসতে বসতেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার কিছু লেখার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এগুলির প্রশংসা করলেন। কিন্তু তখনও আমি আমার কৌতূহল দমন করে ভদ্রলোককে নিরীক্ষণ করে চলেছি। আলাপচারিতায় তিনি যখন জানলেন আমাদের মূল বাড়ী নবীগঞ্জ থানার ইনাতগঞ্জের আগনায় ছিলো তখন তাঁর আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি আমার পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এ ব্যাপারে আমার যতটুকু জানা ছিলো তাই বলরাম। তিনি জানালেন তাঁর বাড়ীও নবীগঞ্জ থানার মুকিমপুরে। একবার নবীগঞ্জ থানার শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের উল্লেখ করে বর্তমানের করুণ চিত্রে তিনি যে ব্যথিত তাও জানালেন। ইতোমধ্যেই 'চা-টা' এসে গেছে। দু'জনের এই জমজমাট আড্ডার মধ্যেই তিনি তাঁর প্রবাসী জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা বলে চললেন। এক সময় বললেন, 'আমিও একটু আধটু লিখি, যদি একটু কষ্ট করে একটা পাণ্ডুলিপি পড়ে দেন...।' এই বলে তিনি তাঁর লেকা পাণ্ডুলিপি বের করে আমার হাতে দিলেন। আমি সত্যিই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম। পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছি। হাতের লিখা স্বচ্ছ, নির্ভুল বানান এবং যথাসম্ভব গুছানো কাহিনী। আমার নিজের হাতের লেখা অমার্জনীয় খারাপ। এছাড়া এ পর্যন্ত আমাকে অনেকেরই পাণ্ডুলিপি পড়তে হয়েছে। কাজেই ভুল বানান আর অস্বচ্ছ লেখার সাথে কি পরিমাণ যুদ্ধ করতে হয়েছে বা এখনও হচ্ছে সে আমি জানি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে আমাকে মুগ্ধ ও অবাক করেছিল। দীর্ঘ সময় কাটিয়ে যখন ফিরে আসছিলাম তখন তিনি আবারও দেখা হবার আকিঞ্চন জানালেন। এই হলো লেখক কথাশিল্পী আবদুর রউফ চৌধুরীর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতের দিনটি।

যতুটুকু মনে পড়ে এ সাক্ষাতের প্রায় তিন বছর পর তাঁর সাথে আবার দেখা হয়। মনে হয় এ সময়টুকু তিনি ইংল্যান্ডে অতিবাহিত করে পরবর্তীতে হবিগঞ্জে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং একজন সার্বক্ষণিক লেখক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এ সময় তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য। কখনো পথে দেখা হয়েছে কখনো কোনো প্রেসে অথবা

পত্রিকা অফিসে। তাঁকে আমি প্রায়ই বলতাম যে স্থানীয়ভাবে বইগুলি প্রকাশ না করে তিনি যেন ঢাকা থেকে বইগুলি প্রকাশ করেন। কারণ স্থানীয়ভাবে মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিড়ম্বনার ভুক্তভোগী আমি নিজেই। তিনি বলতেন যেগুলি এখানে শুরু করেছি সেগুলি শেষ করে বাকীগুলি অবশ্যই ঢাকা থেকে আপনার কথা মতো বের করবো। এভাবেই গত কয়েক বছরে স্থানীয় মুদ্রণে বের হলো তাঁর 'নাম মোছা যায় না', 'ধর্মের নির্যাস', 'সাম্পান ক্রুস' এবং 'নতুন দিগন্ত' নামের দু'খণ্ডের উপন্যাস। তাঁর গল্প গ্রন্থ 'গল্প সম্ভার' বের হয় ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়ে। এ সময়টুকুর মধ্যেই আমার সাথে তাঁর সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হলো। হবিগঞ্জের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সুধী মহলে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলেন। তাঁর বিনয়ী ব্যবহার সকলের প্রশংসা পেল এবং তরুণ মহল তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করলো। বিভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংগঠনের সভা-সমাবেশে তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে উঠলো। দেখা হতে লাগলো আমাদের। নানান প্রসঙ্গে আমাদের মত বিনিময় হতো। আমাদের যুক্তি-তর্ক চলতো দিনের পর দিন। মতান্তর থাকলেও মনান্তর ঘটতো না। সাপ্তাহিক সমাচার কার্যালয়েও তিনি আসতেন। সেখানে তখন আমার দপ্তর। আলোচনা জমে উঠতো। তরুণ লেখক ও সাংবাদিক তফাজ্জল সোহেল সমাচারের জন্য লেখা চাইলে তিনি পরদিনই লেকাটি পাঠিয়ে দেন। ছাপা হয় সেই লেখা। লেখা পড়ে আমার প্রতিক্রিয়া হলো এ ধরনের লেখা আরো বৃহৎ পরিসরে প্রকাশিত হওয়া উচিত। পরদিনই সোহেলকে নিয়ে আবদুর রউফ চৌধুরী সাহেবের বাসায় যাই। প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে বলি যে আপনার লেখা ঢাকার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। ঢাকার পত্র-পত্রিকায় লেখা ছাপার বেশ কিছু রসালো বক্তব্য তিনি শোনালেন। এ ব্যাপারে আমারও বেশ অভিজ্ঞতা আছে। তবে তাঁকে আমি বললাম আপনি সিলেটের পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠাতে পারেন। ওরা ছাপবে আশা রাখি। বিশেষ করে যুগভেরীতে পাঠাতে পারেন। যুগভেরীর সাথে আমার সংশ্লিষ্টতাও তাঁকে জানালাম।

তিনি যুগভেরীতে লেখা পাঠাতে রাজী হলেন। শুরু হলো নতুন এক যাত্রা। তখনও যুগভেরী সাপ্তাহিক হিসেবে তার সমাপ্তি ঘোষণা করেনি। আবদুর রউফ চৌধুরী সাহেবের লেখাগুলি সেখানে প্রকাশিত হতে লাগলো। ১৯২৮ সালের স্থাপিত প্রাচীনতম যুগভেরী নব্বই-এর দশকের সূচনা লগ্নে এসে দৈনিক রূপান্তরিত হলো। সিলেট থেকে দৈনিক যুগভেরীর ভার প্রাপ্ত সম্পাদক আজীজ আহমেদ সেলিম ফোনে জানালেন যে আবদুর রউফ চৌধুরীর লেখা চাই, সিলেটের সুধী মহলে তাঁর লেখাগুলি আলোড়ন তুলেছে। আমি চৌধুরী সাহেবকে সবিস্তারে একথা জানালাম। এরপর একদিন তিনি আমাকে তাঁর 'নতুন দিগন্ত'-এর দুখণ্ড এবং 'সাম্পান ক্রুস'-এর প্রায় একশটি কপি হস্তান্তর করে বললেন এগুলি সিলেটের পাঠকদের হাতে পৌঁছলে কৃতজ্ঞ হবো, বইয়ের মূল্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে আমি চৌধুরী সাহেবের সাথে একমত হতে পারলাম না। কারণটা আশা করি সকলেরই বোধগম্য। একজন লেখক পরিশ্রম করে লিখলেন, নিজের টাকা খরচ করে ছাপালেন এবং তারপর বিনে পয়সায় পাঠকদের হাতে তুলে দেবেন– এটা আমার কাছে অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হলো। সিলেটে অবশ্য বইগুলি ভালই বিক্রী হলো। বই এর টাকা তাঁর হাতে তুলে দিতেই তিনি অবাক হলেন।

পার্থসারথি চৌধুরী
কবি ও সাংবাদিক